DETECTIVE STORIES, No 195. দারোগার দপ্তর, ১৯৫ সংখ্যা।

অদ্ভুত ফকির।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

All Rights Reserved.

সপ্তদশ বর্ষ।] সন ১৩১৬ সাল। [আষাঢ়।

PRINTED BY M. N. DEY, AT THE
Bari Press,
No. 63, *Nimtola Ghat Street, Calcutta.*
1909.

অদ্ভুত ফকির।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দারুণ শীত। আকাশে মেঘের লেশ মাত্র নাই। নির্ম্মল সুনীল অম্বরে থাকিয়া দিনমণি প্রখর-কিরণজাল বিকীরণ করিতেছেন। উত্তরে বাতাস শন্ শন্ শব্দে প্রবাহিত হইয়া শীত-প্রপীড়িত শতগ্রন্থি-ছিন্ন-বসন-পরিহিত মানবগণকে কাঁপাইয়া তুলিতেছে। জানু, ভানু, কৃষাণু আশ্রয় করিয়া শীতার্ত্ত দীন-দরিদ্রগণ কোনরূপে শীত নিবারণ করিতেছে। আমি সেই সময় অফিস-ঘরে বসিয়া আছি।

বেলা আট্‌টা বাজিয়া গিয়াছে; বিশেষ কোন কাজ না থাকায়, আমি একখানি সংবাদ-পত্র দেখিতে ছিলাম, এমন সময়ে একজন কনষ্টেবল আসিয়া সংবাদ দিল, আলিপুরে সরকারদের বাগানে একজন ফকিরের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, সাহেবের হুকুম, আমাকে তাহার অনুসন্ধানের জন্য এখনই সেখানে যাইতে হইবে।

কনষ্টেবলকে আমি দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে হত্যাকাণ্ডের বিষয় বিশেষ কিছুই জানে না। আলিপুরের সরকারেরা বিখ্যাত লোক; তাঁহাদের বাড়ী ও বাগান

আমার বিলক্ষণ জানা ছিল। কাজেই কনষ্টেবলকে বিদায় দিলাম।

আলিপুরের সরকারেরা বিখ্যাত ধনবান পরিবার। তাঁহাদের নাম ডাক যথেষ্ট। বাড়ীতে সকল প্রকার ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমার সহিত তাঁহাদের কোনরূপ পরিচয় হয় নাই।

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে একখানি গাড়ী আনাইয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক গন্তব্যস্থানে যাইতে লাগিলাম। বেলা প্রায় নয়টা বাজিলেও পথে অধিক লোকের সমাগম নাই। পথের উভয় পার্শ্বের মাঠ সকল ফল-পুষ্পে সুশোভিত বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা পরিপূর্ণ। কৃষকগণ মাঠে গোচারণ ও বৃক্ষপরিচর্য্যায় নিযুক্ত।

প্রায় আধ ঘণ্টা শকটারোহণে গমন করিবার পর আমরা সরকারদিগের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলাম। দেখিলাম, নিকটস্থ মাঠ সকলে বৃক্ষাদির নামগন্ধও নাই, তদ্ভিন্ন মাঠগুলির অবস্থা দেখিলে বোধ হয়, যেন কাহারও সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

আমি দেখিলাম, সেই সকল মাঠের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য মাঠ সকল বেশ উর্ব্বরা, সেখানে সকল বৃক্ষই ফল-পুষ্পে সুশোভিত, অথচ এই মাঠগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহার কারণ কি, জানিবার জন্য আমার কৌতূহল জন্মিল। আমি আমার সমভিব্যাহারী আবদুল কাদের নামক কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আবদুল কাদের! এই মাঠগুলির অবস্থা এমন কেন? দেখ দেখি, ইহার নিকটস্থ মাঠগুলি কেমন সুন্দর? আর এ গুলির অবস্থা দেখিয়া সত্যই আমার বড় কষ্ট হইতেছে। তুমি এদিকে আর কখনও আসিয়াছিলে কি?"

আবদুল ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, "হুজুর! আপনার আশীর্ব্বাদে এ অঞ্চলের এমন গ্রাম নাই যেখানে এ অধীন প্রত্যহ না আইসে। আমি বেশী কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। হুজুরের সময় অতি মূল্যবান তাহা আমি বেশ জানি। কিন্তু এ অঞ্চলের এমন কোন বাড়ী ঘর মাঠ বা বৃক্ষ নাই, যাহা আমি না জানি। সেদিনের সেই অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার,—"

বাধা দিয়া আমি আবদুলকে বলিলাম, "থাক্ থাক্, আর সে কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। এই সকল মাঠের এমন অবস্থা কেন, যদি তোমার জানা থাকে, তবে অতি অল্প কথায় বল।"

আবদুল ঈষৎ হাসিয়া অতি আগ্রহ সহকারে বলিল, "দুই কথায় আমি আপনাকে সমস্তই বুঝাইয়া দিতেছি। আপনার মত বিচক্ষণ লোককে অধিক কথা বলিবার আবশ্যক হয় না। আপনার মত জ্ঞানী কয়জন আছে? আমি কি জানি না যে, আপনার সময়ের মূল্য কত? কতকগুলা অনাবশ্যকীয় কথা বলিয়া আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করা—"

আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। এদিকে আমাদের গাড়ীও সরকারদিগের বাড়ীর দরজায় আসিল দেখিয়া বলিলাম, "থাক্ আবদুল! আর তোমার দুই কথায় বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা কার্য্যস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি।"

আবদুল আমার কথায় কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না। সে নিস্তব্ধভাবে গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। আমিও নামিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, একজন প্রৌঢ় দ্রুতপদসঞ্চারে আমার দিকে আসিতেছেন। নিকটে আসিলে দেখিলাম, তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর। তাঁহার দেহ নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব, বর্ণ গৌর কিন্তু

লাবণ্যহীন, চক্ষু আয়ত, কিন্তু উজ্জ্বলতাশূন্য, মস্তকে দুই এক গাছি পক্ক কেশ দেখা দিয়াছে। তাঁহার পরিধানে একখানি সাদাধুতি, গাত্রে একটা ক্ষুদ্র পিরান, পায়ে এক জোড়া চটী জুতা, হস্তে এক গাছি লাঠী, চক্ষে সোণার চশমা। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি সুখের ক্রোড়ে পালিত হইলেও কষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি পান নাই। তাঁহার ললাটে চিন্তা-রেখা সুস্পষ্ট-রূপে প্রতীয়মান হইতেছিল।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনিই বাড়ীর মালিক, সরকার বংশের বংশধর, নাম গৌরীশঙ্কর। সরকারদিগের বাড়ীখানি প্রকাণ্ড ও দ্বিতল। অট্টালিকার সম্মুখেই এক প্রকাণ্ড উদ্যান। সেই উদ্যানের ভিতর একখানি সামান্য কুটীরে এক ফকির বাস করিতেন। সেদিন প্রত্যূষে তাঁহারই মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম সম্ভাষণের পর আমি গৌরীশঙ্করকে ঐ হত্যাকাণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। গৌরীশঙ্করের সঙ্গে দুই তিনজন ভৃত্য আসিয়াছিল। গৌরীশঙ্কর একবার আমার মুখের দিকে আর একবার সেই ভৃত্যদিগের দিকে চাহিলেন দেখিয়া, আমি তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম। বলিলাম, "আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন। সকল কথা সকলের সমক্ষে বলা বিচক্ষণ ব্যক্তির উচিত নহে।"

গৌরীশঙ্কর আমার সঙ্কেতবাক্য বুঝিতে পারিলেন এবং তখনই তাহাদিগকে তথা হইতে বিদায় দিলেন। পরে আমাদের উভয়কে একটী নির্জন গৃহে লইয়া গিয়া প্রথমে অতি সমাদরে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমরা যথাস্থানে উপবেশন করিলে পর, গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "দুই মাস পূর্ব্বে এক ফকির আমার আলয়ে উপস্থিত হন। এ পর্য্যন্ত তিনি কোথাও স্থায়ী হন নাই; দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন এবং অবশিষ্ট সময় কোন বৃক্ষতলে কিম্বা নদীতটে বসিয়া ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কি বলিতে পারি না, কিন্তু সাধারণে তাঁহাকে পূর্ণানন্দ স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মকথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তিনি একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত, চারিখানি বেদ তাঁহার কণ্ঠস্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ ভাবিয়া আমি তাঁহাকে এইখানে কিছুদিন বাস করিতে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি প্রথমতঃ স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, তিনি সন্ন্যাসী, বহুদিন সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন আর সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইল। তখন আমার অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়াছিল। আমি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, মাঠে শস্য উৎপন্ন হইত না, কৃষকদিগের নিকট হইতে রীতিমত খাজনা আদায় হইত না। নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াও আমি অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারি নাই। সেই জন্য ফকিরকে দেখিয়া আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনিই আমাকে সেই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন। আমি তখন তাঁহাকে

এখানে রাখিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলাম; আমার ঐকান্তিক অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে তিনি সম্মত হইলেন।

"সেই অবধি তিনি আমারই আলয়ে বাস করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক বিষয়ে আমি তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে লাগিলাম এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল, ক্ষেত্র সমূহে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল, প্রজাগণ সানন্দ অন্তঃকরণে খাজনা দিতে লাগিল, আমারও বেশ স্বচ্ছলে ও সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ, দৈনিক কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় যখন তাঁহার নিকটে বসিয়া নানা শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিতাম, তখন আমার বোধ হইত, যেন আমি এই নরলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছি। হায়! আর কি সেই মধুমাখা কণ্ঠস্বর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না?"

এই বলিয়া গৌরীশঙ্কর স্থির হইলেন। তাঁহার মুখ দিয়া আর বাক্য নিঃসরণ হইল না, তিনি দুই হস্তে আপনার মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বালকের মত রোদন করিতে লাগিলেন।

আমি কোনরূপ সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলাম না। সে সময় কোন প্রকারে সহানুভূতি প্রকাশ করিলে পাছে আরও শোকান্বিত হন, এই ভয়ে আমি কোন কথা কহিলাম না; অন্যমনস্কভাবে ঘরের চারিদিক লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে গৌরীশঙ্কর আত্মসংবরণ করিলেন। পরে বলিলেন, "ঈশ্বর আমার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে আজ আমার এ দুর্দ্দশা হইত না; আমার

উন্নতির পথে কণ্টক পড়িত না; আমার শ্রীবৃদ্ধির সময়ে ফকির মারা পড়িতেন না। এতকাল নিদারুণ দারিদ্রকষ্ট ভোগ করিয়া, অকালে জরাগ্রস্ত হইয়া যদি বা শেষ অবস্থায় সুখের মুখ দেখিতে পাইলাম, তত্রাপি আমার মনোকষ্ট ঘুচিল না, পুনরায় ভয়ানক বিপদে পতিত হইতে হইল।"

এইরূপে আরও কিছুক্ষণ অনুতাপ ও বিলাপ করিবার পর গৌরীশঙ্কর স্থির হইলেন। কিন্তু যে কার্য্য করিবার জন্য আমি সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন ফকির কিরূপে মারা পড়িলেন তাহাই বলুন? আপনার মত জ্ঞানবান ব্যক্তির বিপদে ধৈর্য্যচ্যুত হওয়া উচিত হয় না। যখন তিনি মারা পড়িয়াছেন, তখন আর তাঁহার জন্য বৃথা বিলাপ করিলে কি হইবে? এখন যাহাতে তাঁহার হত্যাকারী যথোচিত শাস্তি পায়, তাহার উপায় করুন। বলুন, কিরূপে ফকির হত হইলেন?"

আমার কথা শুনিয়া গৌরীশঙ্কর অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "ঈশ্বর জানেন, কোন্ নিষ্ঠুর নৃশংস নরাধম রাক্ষস সেই দেবোপম ফকিরকে হত্যা করিল! গত রাত্রে তাঁহার মুখে শাস্ত্র-কথা শুনিয়া যখন বিদায় হই, তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। তখন তিনি শারীরিক বেশ সুস্থ ছিলেন, তাহার মনও বেশ আনন্দিত ছিল। তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া আমি শয়নগৃহে গিয়া বিশ্রাম করি, তিনিও কুটীরে পর্ণশয্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আজ প্রাতঃকালে যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে আমি উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হই, তখন তাঁহার কুটীরে লোকে লোকারণ্য। আমাকে দেখিয়া আমার এক ভৃত্য দৌড়িয়া আমার

নিকটে আসিল, বলিল, 'ফকির মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন।' হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে আমি স্তম্ভিত হইলাম। তখনই তাহার সহিত কুটীরের ভিতর গমন করিলাম। দেখিলাম, তাঁহার মস্তকে গুরুতর প্রহারের চিহ্ন রহিয়াছে। বুঝিতে পারিলাম, আমার প্রিয় সুহৃদ সেই ফকিরকে কে হত্যা করিয়াছে। তখন একজন কনষ্টেবলকে থানায় প্রেরণ করিয়া কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করতঃ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। এখন আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি আসিয়াছেন।"

গৌরীশঙ্করের কথা শুনিয়া আমিও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাবিলাম, ফকির সাধু ব্যক্তি, ঈশ্বরারাধনা, ঈশ্বরের নাম চর্চ্চা ও শাস্ত্র-কথা ভিন্ন তিনি আর কোন প্রকার সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন না। এ অবস্থায় তাঁহার শত্রু কে? শত্রু না হইলেই বা তাঁহাকে হত্যা করিবে কে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর আমি গৌরীশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ঐ স্থানে গমন করিয়া ফকিরের কুটীরের ভিতর কোন অস্ত্র দেখিয়াছিলেন কি?"

গৌ। আজ্ঞে না, কোনপ্রকার অস্ত্র দেখি নাই।

আ। তবে মস্তকে কিসের চিহ্ন দেখিয়াছিলেন?

গৌ। ফকিরের হস্তে একগাছি মোটা লাঠী থাকিত। তিনি সর্ব্বদাই সেই লাঠী হস্তে লইয়া বেড়াইতেন; এক মুহূর্ত্তের জন্যও লাঠী ছাড়িতেন না। আজ প্রাতে তাঁহার মৃতদেহের পার্শ্বে সেই লাঠীগাছটী পড়িয়াছিল। তাঁহার মস্তকে যে ভয়ানক আঘাতের চিহ্ন দেখিয়াছি, তাহা নিশ্চয়ই সেই লাঠীর দ্বারাই হইয়াছে।

আ। এ অঞ্চলে তাঁহার কোন শত্রু ছিল জানেন?

গৌ। আজ্ঞে না। তিনি একজন সংসারত্যাগী লোক, তাঁহার আবার শত্রু কে?

আ। তবে হত্যা করিল কে? যদি তাঁহার শত্রুই না থাকিবে, তবে তিনি অপরের হস্তে নিহত হইবেন কেন?

গৌরীশঙ্কর কোন উত্তর করিলেন না। তিনি আমার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে আপনি কাহাকে সন্দেহ করেন? একজন নিরীহ সংসার-বিরাগী যোগীপুরুষকে কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কেই বা হত্যা করিল? ফকির যখন আপনার উদ্যানে হত হইয়াছেন, তখন আপনি যে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবেন তাহা হইবে না। হত্যা-কারীকে ধৃত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। থানায় সংবাদ পাঠান ভিন্ন আর কোনরূপ সন্ধান লইয়াছিলেন কি?"

আমার কথায় ও প্রশ্নে গৌরীশঙ্কর যেমন উত্তেজিত হইলেন। বলিলেন, "বলেন কি মহাশয়! আমার পরম হিতকারী উপদেষ্টা গুরু সদৃশ মাননীয় ব্যক্তি মারা পড়িলেন, আর আমি নিশ্চিন্ত থাকিব? আমি কি করিয়াছি এখনই জানিতে পারিবেন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, যেরূপে পারি হত্যাকারীকে ধৃত করিব।

যতক্ষণ না সে ইহার উচিতমত শাস্তি পায়, ততক্ষণ কোন প্রকারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। কিন্তু কেমন করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে বলিতে পারি না। ফকিরের একটী পয়সাও সম্বল ছিল না, সঞ্চয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না, ভবিষ্যতের ভাবনা তিনি কখনও ভাবিতেন না। কেমন করিয়া বলিব, কাহার উপর আমার সন্দেহ হয়?"

আ। পূর্ব্বে কুটীরে যে যে দ্রব্য যেখানে ছিল, এখনও সেই সেই দ্রব্য সেই সেই স্থানে আছে?

গৌ। আজ্ঞে হাঁ। ফকিরের কুটীরে বিশেষ কোন দ্রব্য নাই, আপনি স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবেন।

আ। প্রায় দুই মাস হইল ফকির আপনার নিকট বসবাস করিয়া আসিতেছিল, ইতিপূর্ব্বে কোন দিন তাহাকে কোনরূপ বিমর্ষ বা ভীত দেখিতে পান নাই?

গৌ। আজ্ঞে না—তাঁহার সদাই হাস্য বদন, তাঁহাকে কখনও বিমর্ষ দেখি নাই; আর ভয়?—ভয় কাহাকে বলে, বোধ হয়, তিনি জানিতেন না।

আ। তবে কি অভিপ্রায়ে কেই বা ফকিরকে হত্যা করিল? ভাল করিয়া মনে করুন, কাহারও উপর আপনার সন্দেহ হয় কি না?

গৌরীশঙ্কর কিছুক্ষণ কোন কথা কহিলেন না। যেন কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। পরে অতি মৃদুস্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, ফকিরের নিজের এমন কোন দ্রব্য ছিল না যাহার লোভে কেহ তাঁহাকে হত্যা করিবে। তাঁহার মৃত্যুতে অপরের কোনপ্রকার লাভের সম্ভাবনা দেখিতে পাই না; সুতরাং

সে জন্য তাহাকে কেহই হত্যা করিবে না। ফকিরের নিজের কোন শত্রু নাই। তাঁহার মৃত্যুতে আমার যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। এই দুই মাসের মধ্যে আমি তাঁহারই উপদেশে এত উন্নতি করিয়াছি। আমার দু-একজন শত্রু আছে—তাহারা যে আমায় ক্ষতিগ্রস্ত দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাদের কেহ যদি এ কার্য্য করিয়া থাকে বলিতে পারি না।

এই বলিয়া গৌরীশঙ্কর আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার অনুমান সত্য হইতে পারে কিন্তু কে আপনার শত্রু ?"

গৌরীশঙ্কর আবার কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইলেন। পরে বলিলেন, "আমার পুরাতন ম্যানেজার মহাশয় পূর্ব্বে আমারই বেতনভোগী ভৃত্য ছিলেন, কিন্তু এখন আমার ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।"

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কারণ কি ?"

গৌ। কারণ, আমি তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিয়াছি। যখন আমার জমীদারী তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলাম এবং যখন ফকিরের পরামর্শেই আমার যথেষ্ট উন্নতি হইতে লাগিল, তখন আর আমার তাঁহাকে প্রয়োজন কি ? বৃথা কেন তাঁহাকে বেতন দিব।

আ। আপনার যুক্তি মন্দ নয়। আপনার ম্যানেজার মহাশয়ের নাম কি ? তাঁহার নিবাস কোথায় ?

গৌ। তাঁহার নাম অভয়চরণ মুখুয্যে, বাসা কলুটোলায়। অনুমতি করেন ত তাঁহাকে এখানে ডাকিয়া পাঠাই। তাঁহাকে একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেই সমস্ত জানিতে পারিবেন। আরও একটী কথা আছে। বোধ হয় তাহাতেও আপনার অনু-

সন্ধানের সুবিধা হইতে পারে। যদি অনুমতি করেন, আমি অল্প কথায় ব্যক্ত করি। আপনার সমভিব্যাহারী কর্ম্মচারী সে কথা জানে। আপনার কর্ম্মচারী নিকটেই ছিল। এতক্ষণ সে কোন কথাই কহে নাই; চুপ করিয়া সকল কথা শুনিতেছিল।

কর্ম্মচারী, তাহার নাম শুনিয়া, চমকিয়া উঠিল এবং আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, "আজ্ঞে হাঁ; আমি সে কথা জানি। আপনি হুকুম দিলে আমি এখনই দুই কথায় বলিতে পারি। পঞ্চাশ বৎসর আমার বয়স। প্রায় ত্রিশ বৎসর হুজুরের চাকরি করিতেছি। এ সকল কথা যদি আমি না জানিব তবে জানিবে কে? আর হুজুরের নিকট বেশী কথা বলিয়া সময় নষ্ট করাও উচিত নয়।"

বাধা না দিলে সে আরও কত কি বলিত বলা যায় না। কিন্তু আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। একটু কর্কশ স্বরে বলিলাম. "থাক্, আর তোমার দু-কথায় কাজ নাই। অগ্রে লাসটী দেখিয়া আসা যাউক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মচারী আর কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। গৌরীশঙ্কর বাবু আমার কথা শুনিয়া অগ্রসর হইলেন। আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। কর্ম্মচারী আবদুলও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাড়ীর সম্মুখেই বাগান। প্রকাণ্ড উদ্যান—নানাজাতীয় ফল ও ফুলের গাছ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চারিদিকে শোভা

পাইতেছে। বাগানের মধ্যে একখানি দ্বিতল অট্টালিকা। অট্টালিকা হইতে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে বাগানের একপার্শ্বে এক-খানি সামান্য কুটীর। গৌরীশঙ্কর সেই কুটীরদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন।

আমি বুঝিতে পারিলাম, ফকিরের মৃতদেহ সেই কুটীরেই ছিল। গৌরীশঙ্কর কুটীরের দ্বার খুলিয়া দিলে আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি-লাম। দেখিলাম, ঘরে বিশেষ কোন আসবাব নাই। মাটীর মেঝের উপর মাদুর বা সতরঞ্চ পাতা ছিল না। ঘরের একপার্শ্বে সামান্য একখানি খাটিয়া। তাহার উপর একখানি তোষক, দুইটা বালিশ ও একখানি পরিষ্কার চাদর। খাটিয়ার নিম্নে একটী গাঁজার কলিকা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারই নিকট একটী মৃণ্ময় পাত্রে খানিকটা তামাক, কয়েকখানি টিকে, একটী দিয়াশালাইএর বাক্স ও তিনটা কলিকা। বিছানার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, ফকির পূর্ব্বরাত্রে সেখানে শয়ন করে নাই। ঘরের মেঝের উপর ফকিরের মৃতদেহ উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল। তাহার মস্তকের পশ্চাদ্দিক হইতে রক্তস্রোত নির্গত হইতেছিল;—ঘরে যেন রক্তের নদী প্রবাহিত হইতেছিল। দেহের পার্শ্বে একগাছি মোটা লাঠী পড়িয়াছিল। লাঠীগাছটী গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম, তাহাতে রক্তের চিহ্নমাত্র ছিল না। লাঠী-গাছটী মৃতদেহের পার্শ্বে থাকিলেও তদ্দ্বারা যে ফকির আহত হয় নাই তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। ফকিরের বয়স গৌরীশঙ্করেরই মত প্রায় চল্লিশবৎসর। কিন্তু এই বয়সেই তাহার শরীর শুষ্ক জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার চক্ষু কোটরগ্রস্ত হইয়াছে, ললাট কুঞ্চিত হইয়াছে, অনেকগুলি চিন্তারেখা দেখা দিয়াছে, তাহার

বাহুদ্বয় শীর্ণ কিন্তু আজানুলম্বিত, তাহার কেশে জটা, সর্ব্বাঙ্গ যেন ভস্মাবৃত। বক্ষে ললাটে হস্তে তিলক-মাটীর ছাপ। ফকিরের পরিধানে একখানি গৈরিক বসন ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তাহার মুখে একটা ক্ষতচিহ্নও ছিল। তাহার গলদেশে কতকগুলি রুদ্রাক্ষ ও কতকগুলি বড় বড় পাথরের একগাছি মালা ছিল। পাথরগুলি মূল্যবান কি না, জানিতে পারিলাম না; কিন্তু তাহার মধ্যে এক একখানি প্রস্তর ডিম্বের মত বৃহৎ ছিল।

কুটীরের বাহিরে তাহার উত্তর পার্শ্বে দুইটী খড়ের স্তূপ ছিল। সেখানে গৌরীশঙ্করের বাৎসরিক খড় সঞ্চিত থাকে। ঘরের মেঝে ও উদ্যানের সেই অংশের মাটী এত শক্ত যে, সেখানে কোনরূপ পদচিহ্ন থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

সে যাহা হউক, আমি অগ্রে ফকিরের মৃতদেহ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলাম। পরে ঘরের মেঝের উপর যাহা কিছু চিহ্ন ছিল তাহাও বিশেষ করিয়া দেখিলাম। পরে কুটীরের দ্বার ও নিকটবর্ত্তী স্থানসকল ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানে বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলাম না। একে সেখানকার জমী অত্যন্ত শক্ত, তাহার উপর সেখান দিয়া এত লোক যাতায়াত করিয়াছিল যে, সহজে কোন চিহ্ন দেখিয়া কিছু অনুমান করিবার সম্ভাবনা ছিল না।

এই সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া আমি আবদুল কাদেরকে বলিলাম, "আবদুল! ফকিরের লাস পরীক্ষা করিলাম বটে, কিন্তু বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গৌরীশঙ্কর বাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি, তিনি এই কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিশেষ বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু কুটীরের বাহিরে এতগুলি চিহ্ন রহিয়াছে যে, তাহা হইতে

কিছুই সাহায্য পাইলাম না। এখন আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, এখান হইতে সমস্ত লোককে স্থানান্তরিত করিয়া দাও। সকলের সাক্ষাতে এ কার্য্য হইতে পারে না।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে গৌরীশঙ্কর ও আবদুল-কাদের ভিন্ন আর সকলেই সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। তখন আবদুল আমার দিকে চাহিয়া অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর! আমার সন্ধানে একজন লোক আছে, সে এইরূপ চিহ্ন দেখিয়া অনেক কথা বলিতে পারে। তাহার চক্ষের জ্যোতি এত তীক্ষ্ণ যে, যেখানে আর কোন লোক, এমন কি, যন্ত্রের সাহায্যেও কিছুই দেখিতে পায় না, সে সেইখানে কেবল চর্ম্মচক্ষে অনেক বিষয় দেখিতে পায়। হুজুরের যদি হুকুম হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে এখনই এখানে ডাকিয়া আনি।"

আবদুল কাদেরের কথা সত্য বলিয়া বোধ হইল। আমি জানিতাম, ভারতের সিন্ধু-প্রদেশে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা পুরুষানুক্রমে এই কার্য্য করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। পুলিসের কার্য্যে বিশেষতঃ গোয়েন্দা পুলিসের অনুসন্ধানের সময় তাহাদের মত লোকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমিও ইতিপূর্ব্বে দুই একবার ঐরূপ লোকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

আবদুলের কথা শুনিয়া আমি মনে মনে সন্তুষ্ট হইলাম এবং তখনই তাহাকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আবদুল কাদের এক সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল এবং প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই একজন লোক লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমি সেই লোককে তখনই কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। বলিলাম, "দেখ দেখি, ঐ স্থানে কোনপ্রকার পদচিহ্ন দেখা যায় কি না এবং তাহা দ্বারা কি অনুমানই বা করা যাইতে পারে।"

আমার আদেশ পাইয়া সে তখনই সেই স্থান পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। কখন দাঁড়াইয়া, কখন বসিয়া, কখন হামাগুড়ি দিয়া, কখন বা শুইয়া, নানা প্রকারে সে সেইস্থান লক্ষ্য করিতে লাগিল। এক একবার ফকিরের পায়ের দিকেও বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর সে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহার নাম দামোদর। যেভাবে সে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহাতে বোধ হইল, যেন সে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করে।

দামোদরের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি দামোদর! কি দেখিলে? কিছু বুঝিতে পারিয়াছ?"

আমার কথা শুনিয়া দামোদর হাত জোড় করিয়া বলিল, "হুজুর! বুঝিবার শক্তি আমার নাই। আমি যাহা দেখিতে পাইয়াছি, তাহাই বলিতে পারি। এই সকল জমীতে যে সকল

পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়াছি, তাহা দেখিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, চিহ্নগুলি ফকিরের পায়ের চিহ্ন। ফকিরের পা ও এই জমীর উপর যে পায়ের দাগ রহিয়াছে তাহা এক। আর কোন লোকের পদচিহ্ন এখানে দেখিতে পাইতেছি না।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম না। কারণ আমিও ইতিপূর্ব্বে ঐ প্রকারই অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু সে কথা প্রকাশও করিলাম না। দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর একবার ভাল করিয়া দেখ, মানুষ মাত্রেরই ভুল হইতে পারে।"

আমার কথায় দামোদর হাস্য করিল। বলিল, "হুজুর! আপনি আমর ভাল জানেন না। সেই জন্যই এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমার বেয়াদবি মাপ করিবেন, আমি কখনও দুইবার পরীক্ষা করি না। এ অঞ্চলে আমার মত লোক আর নাই বলিলেও হয়; কিন্তু হুজুর, সেজন্য আমি আপনার নিকট অহঙ্কার করিতেছি না। আজ আপনি যেমন বলিলেন, বহুদিন পূর্ব্বে একজন সাহেবও এই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অবশেষে আমার মতেই মত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে সকল চিহ্ন এই ভূমিতে দেখিতে পাইতেছি, তাহা ঐ ফকিরেরই পদচিহ্ন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কতকগুলি পদচিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, সেই লোক যেন এই ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। ফকির যখন ঘরের ভিতর মরিয়া পড়িয়াছিল, তখন সে যে এই কুটীর হইতে বাহির হয় নাই, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে।"

আমি হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "তুমি ভাবিয়াছিলে ফকির আত্মহত্যা করিয়াছে, কেমন?"

অতি আগ্রহ সহকারে দামোদর বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে হাঁ হুজুর! যখন ফকির ভিন্ন আর কোন লোক এই কুটীরের ভিতর প্রবেশ করি নাই, তখন আর কে তাহাকে হত্যা করিবে? সেই নিশ্চয় আপনাকে হত্যা করিয়াছে, অর্থাৎ আত্মঘাতী হইয়াছে। কিন্তু যখন পদচিহ্নগুলি দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সেই লোক ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, তখন আর আমার সে সন্দেহ থাকে না। না হুজুর, আমায় মাপ করিবেন। আমি এ রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহার জন্য আসিয়াছিলাম, যতদূর সামর্থ্য বলিলাম। এখন আপনি যেমন বুঝিবেন সেইমত কার্য্য করিবেন। আমি অনেক বাজে কথায় হুজুরের সময় নষ্ট করিয়াছি।"

আবদুল কাদের এই সময় তাহাকে বাধা দিয়া অতি কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিল, "মিথ্যা কথা বলিয়া হুজুরের সময় নষ্ট করিতে আসিয়াছিস? কি পাগলের মত কথা বলিতেছিস্। ফকিরের এমন কি কষ্ট ছিল যে, তিনি আত্মঘাতী হইবেন? কাহার পদচিহ্ন যদি জানিতে না পারিস, তবে মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজন কি? স্পষ্ট করিয়া বল্, হুজুর, আমার ক্ষমতা নাই, তাহা না করিয়া কতকগুলি মিছা কথা বলিয়া হুজুরের মূল্যবান সময় নষ্ট করিতেছিস্। যা, এখান হইতে দূর হ'। নতুবা তোর অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে দেখিতেছি।"

আবদুলের কর্কশ বাক্যে দামোদর জড়সর হইয়া গেল। সে আর কোন কথা না কহিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার দয়া হইল। আমি আবদুল কাদেরকে বলিলাম, "আবদুল! কেন তুমি দামোদরকে তিরস্কার করিতেছ?

এই শক্ত জমীর উপর যে সকল চিহ্ন হইয়াছে, তাহা এত অপরিষ্কার ও এত অপরিস্ফুট যে, সহজে কোন লোক কিছুই স্থির করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ দামোদরের বয়স হইয়াছে। সে যে ঐ সকল চিহ্ন ভাল করিয়া দেখিতে পাইয়াছে, তাহাও বোধ হয় না। সুতরাং দামোদরকে আর কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। সে যখন সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছে, তখন তাহাকে পুরস্কার দিয়া বিদায় কর, এবং যত শীঘ্র পার ফকিরের মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ আগারে পাঠাইয়া দাও। এখনও যথেষ্ট সময় আছে। যতক্ষণ না ডাক্তার সাহেবের রিপোর্ট পাইতেছি, ততক্ষণ আমি এইখানেই থাকিব। হয় ত আজিকার রাত্রে আমাকে এই স্থানেই বাস করিতে হইবে।"

আমার কথা শুনিয়া আবদুল কাদের অতি গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "হুজুর যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহাই সম্পন্ন করিব। হুজুর যখন এই স্থানে রাত্রে থাকিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন, তখন এই অভাগাকেও এই স্থানে থাকিতে হইবে। কিন্তু—"

আবদুল কাদের কখনও অল্প কথায় সন্তুষ্ট হইত না। একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে সে নানাপ্রকার ভূমিকা না করিয়া কোন কথা বলিতে পারিত না। কিন্তু সকল সময় তাহার কথা ভাল লাগে না। যখন কাজ কর্ম্ম না থাকে, তখন তাহার কথা শুনিতে নিতান্ত কষ্ট বোধ হয় না, কিন্তু কাজের সময় যখন এক মুহূর্ত্তকালও নষ্ট করা যায় না, সেই সময়ে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইতাম।

আবদুলকে বাধা না দিলে সে আরও কত কি বলিত। কিন্তু আমার আর ভাল লাগিল না। বলিলাম, "সকল সময় বেশী

কথা বলিয়া আমার সময় নষ্ট করা তোমার মত জ্ঞানবান লোকের ভাল দেখায় না। তোমাকে যাহা যাহা বলিলাম, অগ্রে তাহা সম্পন্ন কর। পরে তোমার বক্তব্য প্রকাশ করিও।"

আমার কথা শুনিয়া আবদুল কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না, বরং আমি যে তাহাকে জ্ঞানবান বলিয়াছি, তাহাতেই সে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া হৃষ্টচিত্তে আমার আদেশ পালনে নিযুক্ত হইল।

আমি তখন পুনরায় ফকিরের মৃতদেহের নিকট যাইলাম এবং আর একবার বিশেষ করিয়া সেই দেহ পরীক্ষা করিলাম। লাস্‌টী তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিবার পর ফকিরের কুটীরখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে লাগিলাম। কুটীরের প্রত্যেক স্থান, প্রত্যেক কোণ, প্রত্যেক সামান্য গহ্বর, যেখানে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই অতি মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। শীতকালের বেলা—পাঁচটা বাজিতে না বাজিতেই অন্ধকার হইল। ঘরে ঘরে আলো জ্বলিল, চারিদিকে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল, দুই একটী করিয়া অগণন নক্ষত্ররাজি আকাশ-পথে দেখা দিল; দিবাভাগে সূর্য্যের ভয়ে তাহারা লুকাইয়া ছিল, এখন সূর্য্যের অদর্শনে তাহাদের প্রাণে যেন স্ফূর্ত্তি হইল, আহ্লাদে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ লাবণ্যময় হইয়া

উঠিল। তখন তাহারা আবেগভরে নাচিতে নাচিতে নিজ নিজ পথে ধাবিত হইতে লাগিল।

গৌরীবাবুর এক চাকর কুটীরে একটী আলো আনিল এবং অপর লোকের সাহায্যে ফকিরের মৃতদেহ কুটীর হইতে বাহির করিয়া একখানি খাটের উপর রাখিল। অবিলম্বেই পরীক্ষার জন্য উহা সরকারী ডাক্তারের নিকট নীত হইল।

ফকিরের মৃতদেহ স্থানান্তরিত হইবার পর আমি যেমন কুটীর হইতে বাহির হইব, অমনি কুটীরের একটী বেড়ার অন্তরালে একটী সামান্য গহ্বর দৃষ্ট হইল। গহ্বরটী এরূপভাবে ছিল যে, সহজে কেহ উহা দেখিতে পাইত না। আমি পূর্ব্বে কুটীরখানি তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু গহ্বরটী তখন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

কুটীরের মধ্যে আমি একাই ছিলাম। আবদুল ও গৌরীবাবু বাহিরে আমার অপেক্ষা করিতেছিল। গৌরীবাবুর লোকেরা ফকিরের মৃতদেহ লইয়া গিয়াছিল। দুইজন কনষ্টেবলও তাহাদের সঙ্গে ছিল।

আমি কোন শব্দ না করিয়া ধীরে ধীরে সেই গহ্বরের নিকট গেলাম। দেখিলাম, গহ্বরের মধ্যে একটী পিতলের লোটা ও একটী ক্ষুদ্র মাটীর সরা। লোটায় খানিক জল ছিল, সরাখানির ভিতরেও কি এক প্রকার তরল পদার্থ—বর্ণ ধূসর—কি যে ছিল, তখন কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম, ভাবিলাম, গৌরীবাবুকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু কি জানি কেন সাহস হইল না। মনে হইল, গৌরীবাবুকে বলিলে অপকার ভিন্ন উপকার হইবে না।

লোটা ও সেই সরা আরও লুক্কায়িত রাখিয়া আমি কুটীর হইতে বাহির হইলাম। দেখিলাম, গৌরী বাবু ও আবদুল একটী বৃক্ষতলে বসিয়া অতি মনোযোগের সহিত কথা কহিতেছে।

সকলে মিলিয়া গৌরী বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। তিনি যথেষ্ট সমাদর করিয়া আমাকে একটী সুসজ্জিত বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। ঘরটী প্রকাণ্ড—সেকেলে ধরণে সাজানো। ঘরের ভিতর ঢালা বিছানা—প্রথমে মাদুর, পরে সতরঞ্চ, তৎপরে কোমল গালিচা, তদুপরি দুগ্ধফেণনিভ শ্বেতবর্ণের চাদর। বিছানার চারিদিকে আটটী সুকোমল তাকিয়া, বিছানার উপর চারিটা বৈঠকে চারিটা সোনাবাঁধান হুঁকা। ঘরের মধ্যে তিনটী প্রকাণ্ড বেলোয়ারী ঝাড়, প্রত্যেকটায় বত্রিশটা করিয়া আলোক ধরে। চারিটী দেওয়ালে আটটী দেওয়ালগিরি, প্রত্যেকটায় তিনটী করিয়া আলোকাধার। দুইখানি প্রকাণ্ড আয়না ও একটা মূল্যবান ঘড়ী ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঘরে একখানিও চেয়ার, কৌচ বা খাট ছিল না।

কিছুক্ষণ উপবেশন করিয়া গৌরীবাবু জলযোগ করিবার জন্য আমাকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি অনেকবার অস্বীকার করিলাম। কিন্তু অবশেষে বাধ্য হইয়া সামান্য জলযোগ করিলাম। পরে বলিলাম, "গৌরী বাবু! আপনার কি বক্তব্য আছে এইবার বলুন। আপনি বলিয়াছিলেন, আমার কর্ম্মচারী সে কথা জানে, সেও আমাকে তাহা দুই কথায় বলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তখন আমি ব্যস্ত ছিলাম। বিশেষতঃ তাহার মুখে না শুনিয়া আপনার মুখে শোনাই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম।

আমার কথা শুনিয়া গৌরীশঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বলিলেন, "সেই কথা বলিবার জন্যই ত আমার এত আগ্রহ। আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাহাতে সে কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই অনেক সাহায্য পাইবেন; কিন্তু কথা অনেক—আপনি যদি বিরক্ত না হন তবেই বলিতে পারি।"

আমি মনে মনে বিরক্ত হইলাম। ভাবিলাম, ইনিও যদি আবদুলের মত অল্পভাষী হন, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! প্রকাশ্যে বলিলাম, "যত অল্প কথায় বলিতে পারেন ততই মঙ্গল। সকল কথা অল্পে বলাই বুদ্ধিমানের—"

আমায় বাধা দিয়া গৌরী বাবু বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়ই! আমিও অতি অল্প কথায় বলিতেছি।"

এই বলিয়া গৌরী বাবু কি ভাবিয়া একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; পরে বলিলেন,—"কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এইস্থানে নীলরতন নামে এক প্রৌঢ় বাস করিতেন। তাঁহার যমজ পুত্র ছিল। একজনের নাম গৌরীশঙ্কর অপরের নাম হরশঙ্কর। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন উভয়ের বয়স একুশ বৎসর। কোন কারণে দুই ভ্রাতার মধ্যে ভয়ানক বিবাদ হয়। তাহাদের জমীদারীর অবস্থা উত্তরোত্তর হীন হওয়ায় উভয়েই আপন আপন হস্তে উহার ভার গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় পিতার নিকট আবেদন করে। নীলরতন তাহাদের আবেদন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলেন। বলিলেন, যতকাল তিনি জীবিত থাকিবেন, ততকাল জমীদারীর ভার স্বহস্তেই রাখিবেন,—কখনও হস্তান্তরিত করিবেন না। এই বিষয় লইয়া তিনজনে মহা কলহ হইল। অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর এই স্থির হইল যে, নীলরতন উভয় পুত্রকেই

জমীদারী সমান অংশে ভাগ করিয়া দিবেন। হরশঙ্কর ইহাতে বিরক্ত হইল। সে বলিল যে, সে যখন গৌরীশঙ্করের অপেক্ষা অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বয়সে বড়, তখন অংশ সমান হইতে পারে না; তাহাকে জমীদারীর দশ আনা অংশের এবং গৌরীশঙ্করকে ছয় আনা অংশের ভাগ দিতে অনুরোধ করিল। গৌরীশঙ্কর ইহাতে মহা রাগান্বিত হইল এবং উভয় ভ্রাতায় অনেক দিন ধরিয়া অত্যন্ত বিবাদ চলিতে লাগিল। এই সময়ে গৌরীশঙ্কর কোন বিবাহ উপলক্ষে এখান হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে কোন গ্রামে যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। হরশঙ্কর এই সুবিধা পাইয়া পিতার নিকট নিজের মত বজায় রাখিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। নীলরতন কিন্তু গৌরীশঙ্করের অসাক্ষাতে কোন কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন পিতা পুত্রে বিষম বিবাদ হইল। সকলেই সেই কলহের কথা জানিতে পারিল। পরদিন প্রাতেই নীলরতনকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখা গেল। তাহার মস্তকে গুরুতর প্রহারের চিহ্ন ছিল। তিনি হরশঙ্কর—হরশঙ্কর বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। হরশঙ্করের লাঠী রক্তাক্ত অবস্থায় নীলরতনের পার্শ্বেই ছিল। হরশঙ্করের ঘর হইতে তাহার রক্তমাখা কাপড় বাহির হইল। হরশঙ্কর পিতৃ-হত্যাকারী বলিয়া ধৃত হইল। পূর্ব্ব-দিন রাত্রে সে পিতার সহিত অত্যন্ত বিবাদ করিয়াছিল, সে কথা হরশঙ্কর স্বীকার করিল। কিন্তু সে পিতাকে হত্যা করে নাই, এ কথাও দৃঢ়রূপে বারম্বার বলিয়াছিল। বিচারে তাহার ফাঁসি হইল না—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল। হরশঙ্কর আণ্ডামানে নীত হইল। গৌরীশঙ্কর জমীদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে

সক্ষম হইল না। যেদিন হইতে সে জমীদারী পাইল, সেদিন হইতে আর মাঠে ফশল নাই, প্রজাগণ হাহাকার করিতে লাগিল, খাজনা আদায় করা দায় হইয়া পড়িল। অবশেষে গৌরীশঙ্কর হতাশ হইয়া পড়িল। আমিই সেই গৌরীশঙ্কর।" এই বলিয়া গৌরীশঙ্কর স্থির হইলেন।

আমি এই গল্পের সহিত ফকিরের মৃত্যুর যে কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার গল্পের সহিত ফকিরের মৃত্যুর সম্বন্ধ কি বুঝিলাম না, গল্পের অবতারণা কেন করিলেন?"

গৌরীশঙ্কর ক্ষণকালমাত্র আমার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ অবনত করিলেন। পরে বলিলেন, "অবশ্য আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি না; কিন্তু আমার বোধ হয়, এই ফকিরকেই আমার ভাই হরশঙ্কর—"

আমি চমকিত হইলাম। মনে হইল, গৌরীশঙ্কর তামাসা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি গম্ভীর! আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। আপনার বেশ জানা আছে যে, যাবজ্জীবন কারাবাসের অর্থ কুড়ি বৎসর কারাবাস। হরশঙ্কর হয়ত কুড়ি বৎসর পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। হয়ত সে এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল, আপনার মুখের আকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, কাহারও সাধ্য ছিল না, তাহাকে হরশঙ্কর বলিয়া চিনিতে পারে। আমি সহোদর ভ্রাতা হইলেও হয়ত চিনিতে পারি নাই। অবশেষে হয়ত সুবিধা পাইয়া গোপনে এখানে আসিয়া আমার একমাত্র উপকারী বন্ধু ও সৎ-পরামর্শ-

দাতা ফকিরকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। সেই আমার ভয়ানক শত্রু। কিসে আমার ও আমার পরিবারবর্গের অপকার করিবে, ক্রমাগত এই চিন্তা করিয়া শেষে হয়ত এই ভয়ানক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। আপনি আমায় সন্দেহের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিয়া এই কথা বলিতে বাধ্য হইলাম; নতুবা এ সকল কথা উত্থাপন করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যখন কোনরূপ প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন না, যখন সেই লোককে ধরাইয়া দিতে সক্ষম হইবেন না, তখন আপনার এইরূপ সন্দেহের কারণ কি? আর এ কথা উত্থাপনই বা কেন করিতেছেন?"

গৌ। হরশঙ্কর দুর্দ্দান্ত লোক। যে পিতৃহত্যা করিতে পারে, তাহার নিকট কিছুই অসাধ্য নহে। আমার সন্দেহ এই যে, সে বিশ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল এবং পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমার ও আমার পরিবার-বর্গের অপকার করিতে মনস্থ করিয়াছিল। ছদ্মবেশে না আসিলে পাছে আমি দূর করিয়া দিই, এই ভয়ে সে ঐরূপ বেশে এখানে আসিয়া আমারই উপকারী মন্ত্রীর প্রাণসংহার করিয়াছে।

আ। তবে কি সেই-ই ফকিরকে হত্যা করিল! কিরূপেই বা হত্যা করিল? আর কোন লোক কি ফকিরের নিকট আসিত?

গৌরীশঙ্কর কোন উত্তর করিলেন না। তিনি গম্ভীরভাবে আপনার মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "জগদীশ্বর জানেন, কে ফকিরকে হত্যা করিল কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে আমার যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। এখন হুজুরের নিকট আমার একটী নিবেদন আছে।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বলুন ?"

গৌরীশঙ্কর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "যদি এই ফকিরকে আমার সহোদর যমজ ভাই হরশঙ্কর সত্য সত্যই খুন করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে একা এ কাজ করে নাই। তাহার আরও কয়েকজন সহায় আছে, হরশঙ্কর তাহাদেরই সাহায্যে ফকিরকে হত্যা করিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাহারা যে নিশ্চিন্ত থাকিবে তাহা বোধ হয় না। এখন হইতে তাহারা আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে হত্যা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।"

আ। আপনার অনুমান সত্য হইতে পারে। কিন্তু আপনি এ বিষয়ে আমার কি সাহায্য চান বলুন ?

গৌ। কয়েক দিনের জন্য দুইজন কনষ্টেবলকে এই স্থানে রাখিয়া দিন, এই আমার অনুরোধ।

গৌরীশঙ্করের কথায় আমি মনে মনে হাস্য করিলাম। পরে বলিলাম, "বেশ কথা। যাহা কর্ত্তব্য কাল প্রাতে করা যাইবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ; আপনার কোন ভয় নাই।"

এই বলিয়া আমি গৌরীশঙ্করকে বিদায় দিলাম। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল। আমি তখন কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে সেই বৈঠকখানা হইতে বাহির হইলাম এবং বাহির হইতে উহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া সকলের অগোচরে সেই বাড়ী হইতে প্রস্থান করিলাম। বলা বাহুল্য, আবদুল কাদের গৌরীবাবুর বাড়ীতেই রহিল। সে জানিত যে, আমিও সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রে আমার ভাল নিদ্রা হইল না। রাত্রিশেষে শয্যা ত্যাগ করিয়া আমি পদব্রজেই গৌরীবাবুর বাড়ীর দিকে গমন করিলাম।

যখন গৌরীবাবুর বাড়ীতে পঁহুছিলাম, তখনও ভোর হয় নাই। তখনও মিউনিসিপালের লোক সকল পথের আলোক নির্ব্বাপিত করে নাই। গৌরী বাবুর বাড়ীর সদর দরজা তখনও বন্ধ ছিল, সম্ভবতঃ গত রাত্রে আমার প্রস্থানের পর বাড়ীর দরজা বন্ধ করা হইয়াছিল।

বাড়ীর ভিতর যাইবার জন্য কিছুক্ষণ চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সহজে কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। যদি কেহ সেই সময় আমাকে বাড়ীর বাহিরে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিতে পারিত যে, আমি রাত্রে সেখানে ছিলাম না।

সে যাহা হউক, কিছুক্ষণ পরে আমি প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া গৌরী বাবুর অট্টালিকার বাহির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে সেই প্রাঙ্গন হইতে বৈঠকখানায় যাইবার একটী পথ দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, বৈঠকখানার একটী জানালা খোলা, সেই প্রাঙ্গন হইতে সহজেই সেই জানালায় উঠিতে পারা যায়। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি একলম্ফে সেই জানালায় উঠিলাম। দেখিলাম, ঘরের ভিতর আলোক জলিতেছে, ভিতরে তখন কেহই ছিল না। সুতরাং আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া একেবারে সেই বৈঠকখনায় প্রবেশ করিলাম এবং সেই বিছানায় শয়ন করিলাম।

বেলা সাতটার সময় আমি বৈঠকখানা হইতে বাহির হইলাম এবং গৌরী বাবুর কথামত তাঁহার বাড়ীর দাস দাসী প্রভৃতি সকলেরই এজেহার লওয়া হইল। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। সকলেই একই কথা বলিল। বলিল, হত্যাকাণ্ডের বিষয় তাহারা কিছুমাত্র অবগত নহে।

বাড়ীর সকলের এজেহার লওয়া হইলে আমি আরও অনেক লোককে ফকিরের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; গৌরী বাবুর দাস দাসী ও বাড়ীর লোকেরা সকলেই বলিল যে, ফকিরের নিকট প্রত্যহ অনেক লোকের সমাগম হইত। তাহাদের মধ্যে পরিচিত ও অপরিচিত সকল লোকই থাকিত। কিন্তু অপর লোকেরা বলিল, ফকির অপর কোন লোকের সহিত মিশিত না, সে হয় সেই উদ্যানমধ্যস্থ নিজ কুটীরে বসিয়া একাকী ঈশ্বর-চিন্তা করিত, নতুবা উদ্যান-বাটীকার দালানে বসিয়া গৌরীশঙ্করকে সৎপরামর্শ দান করিত। মোট কথা এই যে, ফকির এক গৌরী-শঙ্কর ভিন্ন আর কোন লোকের সহিতই মিশিত না।

এই সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া আমি গৌরীবাবুর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। দেখিলাম, তিনি অতি সজ্জন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক। জমীদারী সেরেস্তার কর্ম্মে তিনি একজন পাকা লোক। যদিও গৌরীবাবু তাঁহার তত্ত্বাবধানে জমীদারী রাখিয়া যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তত্রাপি তাঁহার কোন দোষ দেখিলাম না। তিনি গৌরীবাবুর মঙ্গলের জন্য—জমীদারীর উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন অদৃষ্ট বিমুখ হয়, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোকেও ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়া থাকে।

বেলা একটার পর গৌরীবাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া গেলাম। তিনি আবদুলের সহিত বাড়ীর দরজায় আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমাকে ফিরিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ম্যানেজারের সহিত আপনার কি সাক্ষাৎ হইয়াছিল? আপনি সেখানে গিয়াছিলেন কি?"

আমি সম্মতিচক উত্তর দিলাম। তখন গৌরী বাবু আরও আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাকে কেমন দেখিলেন? আমার ত বোধ হয় তিনি নিজেই হউক বা অপর লোকের দ্বারাই হউক, ফকিরকে ইহলোক হইতে ফিরাইয়া দিয়া আমার বিলক্ষণ শত্রুতাসাধন করিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ আমার উপকারী পরম বন্ধু ফকিরের প্রাণসংহার করিয়া আমার অপরাধের বেশ প্রতিশোধ তুলিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গৌরীবাবু আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে আর কোন উত্তর না দিয়া আবদুলের সহিত গৌরী বাবুর বৈঠকখানায় গমন করিলাম। গৌরী বাবুও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইলেন।

ক্রমে বেলা নয়টা বাজিল। আমি আর সময় নষ্ট না করিয়া আবদুলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "খাঁ সাহেব! ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিয়াছ? গৌরী বাবু দুইজনের উপর সন্দেহ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার, দ্বিতীয়তঃ তাঁহারই সহোদর ভ্রাতা। এই উভয়ের মধ্যে কেহ ফকিরকে হত্যা করিয়াছে, ইহাই গৌরীবাবুর ধারণা। তুমি কি বিবেচনা কর? এই উভয়ের মধ্যে তুমিই বা কাহাকে হত্যাকারী বলিয়া সাব্যস্ত কর।"

আবদুল করযোড়ে সবিনয়ে উত্তর করিল, "হুজুর! আমি আপনার ক্রীতদাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন আপনি এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন, তখন আমি কোন ছার—আমার অনুমানেই বা আপনার কি সাহায্য হইবে। বিশেষতঃ আপনার সম্মুখে আমার মতামত প্রকাশ করা নিতান্ত বাতুলের কার্য্য। কিন্তু আমি যে হুজুরের কার্য্যে এই ত্রিশবৎসর কাল অতিবাহিত করিলাম, তাহা কি সম্পূর্ণ বিফল হইবে? না, তাহা কখনও হইতে পারে না। সেই জন্য বলিতেছি যে, হুজুর কিছুদিন এখানে থাকিয়া এই বিষয় ভাল করিয়া লক্ষ্য করুন, তাহা হইলেই সমস্ত রহস্য ভেদ করিতে পারিবেন। আমিও নিশ্চিন্ত থাকিব না—প্রাণ-পণে হুজুরের সাহায্য করিব।"

আবদুলের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমি বলিলাম, "খাঁ সাহেব! ভবিষ্যতে যেরূপে পার সাহায্য করিও, কিন্তু এখন আমার গোটা কতক প্রশ্নের উত্তর দাও।"

এই বলিয়া যে লাঠীর দ্বারা সেই ফকিরকে হত্যা করা হইয়াছিল, সেই লাঠীগাছটী লইয়া আমি আবদুলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই লাঠীই কি ফকিরের হস্তে থাকিত?"

আবদুল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ হুজুর! এই লাঠীই সর্ব্বদা তাঁহার হাতে থাকিত। ইহা না লইয়া তিনি তাঁহার কুটীর ত্যাগ করিতেন না।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলাম, "বেশ কথা। দেখ দেখি, লাঠীগাছটীতে শাণিতঅস্ত্র বসে কি না? আমিত উহাতে অনেক কষ্টে ছুরি দিয়া দাগ করিতে পারিয়াছি। লাঠীগাছটী বড়ই শক্ত। এরূপ কাঠ তুমি আর কোথাও দেখিয়াছ কি?"

আবদুল অতি বিনীতভাবে উত্তর করিল, "না হুজুর, এরূপ কাঠ পূর্ব্বে আর কখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।"

আমি উত্তর করিলাম, "আমিও সেইরূপ ভাবিয়া ছিলাম। এই কাষ্ঠ এদেশীয় নহে। ইহাকে লোহা কাঠ বলে। লৌহের মত শক্ত বলিয়াই ইহার ঐ নাম। এ গাছ কেবল আণ্ডামান দ্বীপে পাওয়া যায়। খাঁ সাহেব! ইহা দ্বারা তুমি কিছু বুঝিতে পারিলে কি? যদি না পারিয়া থাক, শোন। আমার বোধ হয় গৌরী বাবুর সহোদর হরশঙ্কর—আণ্ডামান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এখানে আসিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এপর্য্যন্ত কেহই তাহাকে দেখিতে পায় নাই। কেন? যদি হরশঙ্কর সত্য সত্যই এদেশে আসিয়া থাকে, এবং যদি সে গৌরীশঙ্কর বা তাঁহার কোন আত্মীয় বা উপকারী বন্ধুকে হত্যা করিতেই মনস্থ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে যে এই অঞ্চলে বারম্বার আসিবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করা যায় না। সুযোগ সুবিধা না বুঝিয়া হর-শঙ্কর কখনও এই ভয়ানক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। হরশঙ্করকে যখন কেহই দেখিতে পায় নাই, তখন সে যে ফকিরের বেশেই এখানে আসিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ হরশঙ্কর যখন এরূপ আশ্চর্য্য ছদ্মবেশ ধরিতে পারিত, যখন সে তাহার মুখ ও চক্ষের ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করিতে পারিত, তখন তাহাকে কে হরশঙ্কর বলিয়া চিনিতে পারিবে।"

এই বলিয়া আমি গৌরীবাবুর দিকে ফিরিলাম। দেখিলাম, তিনি আমার কথায় শিহরিয়া উঠিলেন। তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, "গৌরীবাবু! আপনি আমার কথায় চমকিত হইতেছেন? আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু আপনার এই ভয়ানক শত্রু এতকাল আপনারই আশ্রয়ে ছদ্মবেশে বাস করিতেছিল। যদি আপনার ম্যানেজার তাহাকে খুন করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে বাস্তবিকই আপনার উপকার করিয়াছে,—অপকার করে নাই। ইহা আমার অনুমান মাত্র; আমি এখন ঠিক করিয়া কোন্ কথা বলিতে পারিতেছি না।"

আমার কথা শুনিয়া খাঁ সাহেব অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। গৌরীবাবুর মুখ বিবর্ণ ও পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুজুর! তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? হরশঙ্কর আমার যমজ ভাই। আমার আকৃতির সহিত তাহার আকৃতির কোন প্রভেদ নাই। আমরা উভয়েই দেখিতে একরূপ। ফকিরের চক্ষু ও মুখ হরশঙ্করের মত নহে। আপনি স্বয়ং ফকিরের চক্ষু ও মুখ দেখিয়াছেন; তাহারা কখনও আমার মত নহে।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলাম, "লোকে—সাধারণে সেইরূপই মনে করিবে বটে। কিন্তু আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ফকির সামান্য লোক নহে। সে অনেক প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করিতে পারিত।"

গৌরী বাবু কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া আমি বলিতে লাগিলাম, "এই দুই পাত্রে যে দুই প্রকার তরল পদার্থ দেখিতেছেন, উহাদ্বারাই সে আপনার সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করিত। আর চক্ষু

ও মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করা বিশেষ গুরুতর বা কঠিন কার্য্য নহে। এখন যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে হরশঙ্করকে কে হত্যা করিল? হরশঙ্করকে এই পৃথিবী হইতে সরাইয়া কাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল?"

আমার কথা শুনিয়া আবদুল বলিয়া উঠিল, "কিন্তু গৌরীশঙ্করকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলিয়া বোধ হয়। হরশঙ্কর গৌশঙ্করেরই শত্রু, সেই উহাকে হত্যা করিতে পারিত কিন্তু যতদূর আমি জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে গৌরীশঙ্করকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "আমারও মত সেইরূপ। গৌরীশঙ্কর যে হরশঙ্করকে হত্যা করে নাই, তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছি।"

গৌরীশঙ্কর আমার শেষ কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, "হুজুর একজন বিশেষ বিচক্ষণ ব্যক্তি। ইনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।"

আমি তখন গম্ভীর ভাবে হেডকনষ্টেবলের দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "খাঁ সাহেব! এখনই এই হরশঙ্করকে গ্রেপ্তার কর। এই হরশঙ্করই গৌরীশঙ্করকে হত্যা করিয়াছে। এতক্ষণ যাহাকে আমরা গৌরীশঙ্কর বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, তিনি বাস্তবিক গৌরীশঙ্কর নহেন—হরশঙ্কর। ফকিরকে হত্যা করে নাই, ফকিরই গৌরীশঙ্করকে হত্যা করিয়াছে। এই হরশঙ্করকে এখনই গ্রেপ্তার কর।"

হরশঙ্কর আমার কথায় আমাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু আমি পূর্ব্ব হইতেই সাবধান ছিলাম। যেমন

সে আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, আমি অমনি দুই হস্তে তাহার দুটী হাত এরূপে ধরিয়া ফেলিলাম যে, সে কোনরূপে বাধা দিতে পারিল না। ইত্যবসরে আমার আর দুইজন কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইল এবং হরশঙ্করের হস্তে হাতকড়ি পরাইয়া দিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

আবদুল কাদের হঠাৎ গৌরীশঙ্কর ওরফে হরশঙ্করকে বন্দী করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর! আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ইনি গৌরীশঙ্কর নহেন—হরশঙ্কর। আর কিরূপেই বা স্থির করিলেন যে, হরশঙ্করই গৌরীশঙ্করকে হত্যা করিয়াছে?"

আবদুলের কথায় আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম। বলিলাম, "তোমার মত লোককে পুলিসের কার্য্যে নিযুক্ত করা সম্পূর্ণ অন্যায়। যাহারা ঘুষ লইয়া সত্য গোপন করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের মত লোককে যত শীঘ্র পারা যায় এই কার্য্য হইতে বিদায় দেওয়া উচিত। তুমি ইতিপূর্ব্বে আমাকে বারম্বার তোমার বেতন বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিয়াছিলে; কিন্তু এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার বেতন বৃদ্ধি কি হ্রাস হওয়া উচিত। যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে আমি তোমার কোন অপকার করিতে ইচ্ছা করি না।

কিন্তু সাবধান, যদি ভবিষ্যতে আর কখনও তোমায় এরূপ কার্য্য করিতে দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমায় দূর করিয়া দিব।"

আবদুল আর দ্বিরুক্তি করিল না। সে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিল না।

আমি তাহাকে তদস্থ দেখিয়া বন্দীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "হরশঙ্কর! তোমার বাহাদুরী আছে। তুমি পৈতৃক সম্পত্তি বা উত্তরাধিকারী হইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহা অতি চমৎকার। জানি না, অন্য কোন লোকের হাতে পড়িলে কি হইত। কিন্তু আমার মত লোকের চক্ষে ধূলি দিতে চেষ্টা করাই তোমার বাতুলের কার্য্য হইয়াছে। যখনই তুমি আমার নিকট ফকিরের মৃত্যুর কথা বলিয়াছ, তখন হইতেই তোমার উপর আমার সন্দেহ হইয়াছে। যে সকল কথা বলিয়াছ, তাহা নিশ্চয়ই শোকোদ্দীপক সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই সেই কথা বলিলে লোকের মনে যেরূপ দুঃখের উদয় হওয়া উচিত অর্থাৎ সেই সকল কথা সত্য হইলে লোকে যেরূপ আন্তরিক বলিতে পারে, তুমি সেরূপ হৃদয়ের সহিত ঐ সকল কথা বলিতে পার নাই। তুমি যেন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়াছিলে। কিন্তু সে অভিনয়েও তুমি তাদৃশ কৃতকার্য্য হইতে পার নাই—কথাগুলি করুণাত্মক বটে কিন্তু তোমার স্বর তেমন করুণ ছিল না।"

আমি চুপ করিলাম। দেখিলাম, হরশঙ্কর আমার দিকে চাহিয়া একমনে আমার কথাগুলি শুনিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন, আমার কথা সত্য কি না? তাহার পর যখন দামোদর কুণ্ডীরের মধ্যস্থ পায়ের দাগ ও ফকিরের পা এই দুইটীর দিকে

বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, তখন আমার আর এক সন্দেহ হয়। আমি দেখিলাম, তোমার পায়ের সহিত ফকিরের পা ও কুটীর মধ্যস্থ সেই পায়ের দাগ ঠিক এক। তখনই আমি তোমার আর ফকিরের প্রত্যেক অঙ্গ তুলনা করি—দেখিলাম, যদিও তোমাদের মুখের কোন সাদৃশ্য নাই, তথাপি অন্যান্য অঙ্গের বেশ মিল আছে। আমি কিন্তু তখন তোমার মুখে তোমাদের যমজ ভাইএর গল্প শুনি নাই। যখনই সে কথা শুনিলাম, তখনই আমার পূর্ব্ব সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হইল। অবশেষে যখন তোমরা কুটীর হইতে বাহির হইয়া আমার অপেক্ষা করিতেছিলে, সেই সময় আমি এই লোটা ও মাটীর এই সরা দেখিতে পাই। লোটার জল ও সরায় কি এক প্রকার রং ছিল। তখন আমি পুনরায় ফকিরের দেহ পরীক্ষা করি—দেখিলাম, তাহার মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে ঐ রং-মাখান। যদিও তখন রং বেশ শুকাইয়া গিয়াছিল, তবুও দেখিলে বোধ হইল, যেন সম্প্রতি রং করা হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া আমার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হইল; কিন্তু তখন কোন কথা না বলিয়া এগুলি আরও লুক্কায়িত রাখিলাম ও তোমাদের সহিত যোগ দিলাম। রাত্রিকালে তোমার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, উহা তোমারই কাজ। তখন আর আমার কোন সন্দেহ রহিল না। তুমিই যে সেই ফকির, আর তুমিই যে গৌরী বাবুকে খুন করিয়াছ তাহা বেশ জানিতে পারিলাম। কুটীরে যে পায়ের দাগ দেখা গিয়াছিল, তাহা তোমারই পায়ের দাগ। তুমিই গৌরীশঙ্করকে তোমার কুটীরে ডাকিয়া আনিয়াছিলে, পরে সুবিধা পাইয়া এই নির্জন কুটীরের মধ্যে সেই ভয়ানক লাঠীর সাহায্যে তাহাকে হত্যা

করিয়াছ। পরে সেই লোটার জলে আপনার দেহের রং তুলিয়া মুখের ভঙ্গী বদলাইয়া স্বয়ং গৌরীশঙ্করের পোষাক পরিয়া গৌরীশঙ্কর সাজিয়াছ এবং প্রকৃত গৌরীশঙ্করকে তোমার পোষাকে অর্থাৎ ফকিরের পোষাক পরাইয়া উহার মুখ তোমার মত পরিবর্ত্তিত করিয়া উহাকে ফকির সাজাইয়া ফেলিয়া রাখিয়াছ এবং নিজে গৌরীশঙ্করের পরিবারবর্গের নিকট গৌরীশঙ্করক্রপে স্থান পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছ, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সাহস করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হও নাই, হত্যার পর হইতেই দূরে দূরে রহিয়াছ। তোমার মনে পাপ, উভয় ভ্রাতা দেখিতে একরূপ হইলেও তোমার মনে ভয়, পাছে অন্তঃপুরের সকলে তোমাকে চিনিয়া ফেলে। তোমার ইচ্ছা ছিল, যে পর্য্যন্ত এই মকর্দ্দমা শেষ না হইয়া যায়, সেই পর্য্যন্ত তুমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে না, ও পরিশেষে ক্রমে ক্রমে তোমার অনুপস্থিতি কালের ভিতরের সমস্ত অবস্থা জানিয়া লইয়া, তোমার সংকল্পিত কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত করিতে পারিলে, আর তোমাকে চিনিবার ভয় থাকিবে না। এই সরাখানিতে যে রং রহিয়াছে, ঐ রংই তোমার মুখে ছিল, এখন গৌরীশঙ্করের মুখে মাখাইয়া উহাকে ফকির সাজাইয়াছ। ধন্য তোমার বুদ্ধি। একাকৃতি যমজ ভাই বলিয়াই তুমি এই চাতুরী প্রকাশ করিতে পারিয়াছ?"

আমার কথা শুনিয়া আবদুল অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি যদি হরশঙ্করই হন, আর যদি গৌরীশঙ্করকে হত্যা করাই ইহার উদ্দেশ্য হয়, তবে ইনি প্রথম হইতে ইহাঁর উপকার করিলেন কেন?"

আ। গৌরীশঙ্করকে ভুলাইবার জন্য তাঁহাকে সদুপদেশ দিয়া তাঁহার আর্থিক অবস্থা ও জমীদারীর আয়ের উন্নতি করিয়া তাঁহার বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহার সমস্ত জানিয়া লইয়াছিলেন।

আবদুল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর, আর একটী জিজ্ঞাস্য আছে। হরশঙ্কর কি কেবল পৈত্রিক সম্পত্তি লাভের আশায় ভ্রাতৃহত্যা করিল? এই সামান্য জমীদারীর জন্যই হরশঙ্কর এত ভয়ানক পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইল?"

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "না, কেবল পৈত্রিক বিষয়ের লোভেই হরশঙ্কর নরহত্যা করে নাই; আরও একটী গুরুতর কারণ ছিল। হরশঙ্কর পিতৃহত্যা করে নাই, গৌরীশঙ্করই প্রকৃত পিতৃঘাতী। কিন্তু দোষ পড়ে হরশঙ্করের উপর। হরশঙ্কর সে সময় তাহা প্রমাণ করিতে পারে নাই; সে দ্বিরুক্তি না করিয়া বিশ বৎসর কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিল। সেই প্রতিশোধ লইবার জন্যই সে প্রত্যাগমন করিয়া গৌরীশঙ্করকে হত্যা করিয়াছে। গৌরীশঙ্কর এমন কৌশল করিয়া পিতৃহত্যা করিয়াছিল যে, তখন তাহার উপর কেহই সন্দেহ করে নাই। সকলেই হরশঙ্করকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিল। সেই জন্যই গৌরীশঙ্কর সে যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছিল। গৌরীশঙ্করের পাপের কথা এক হরশঙ্কর ভিন্ন আর কেহই জানিত না। কিন্তু তখন তাহার কথায় কেহই বিশ্বাস করিবে না বলিয়া, সে সেকথা প্রকাশ করে নাই। মনে মনে প্রতিহিংসা লইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সে আণ্ডামান দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। এখন বুঝিতে পারিলে, হরশঙ্কর কি ভয়ানক লোক!"

আমার কথায় আবদুল আর কোন উত্তর করিল না। আমার অনুমান কতদূর সত্য তাহা নিশ্চয়রূপে জানিবার নিমিত্ত, আবদুল ও ঐ বাড়ীর সমস্ত লোককে সঙ্গে লইয়া, যে স্থানে সেই ফকিরের মৃতদেহ ছিল, সেইস্থানে গমন করিলাম। তথনও ঐ দেহের পরীক্ষা হয় নাই। পরীক্ষাকারী ডাক্তারকে আমার অনুমানের কথা বলিলে, তিনি ঐ মৃতদেহের সমস্ত অঙ্গ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ঐ ধৌতজল পৃথক রাখিয়া দিলেন। মৃতদেহ উত্তমরূপে ধৌত হইলে ঐ মৃতদেহের আকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তখন সকলেই উহাকে গৌরিশঙ্কর বলিয়া চিনিতে পারিলেন ও সকলেই বুঝিতে পারিলেন, আমাদিগের অনুমান সম্পূর্ণরূপে সত্য।

ঐ মৃতদেহ-ধৌত জল ও কুটীর হইতে প্রাপ্ত সেই তরল-পদার্থ রাসায়নিক পরীক্ষায় স্থির হইল যে, উহাতে একই পদার্থ মিশ্রিত আছে।

পরিশেষে হরশঙ্কর সমস্ত কথাই স্বীকার করিল। বিচারে তাহার ফাঁসীর হুকুম হইল।

সমাপ্ত।

☞ শ্রাবণ মাসের সংখ্যা

"লুকোচুরি"

যন্ত্রস্থ।